২

গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে
(Govind Sadashiv Ghurye)

'ভারতীয় সমাজতত্ত্বের জনক' G.S.Ghurye ভারতের পশ্চিম উপকূলে 1893 সালের 12ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। Westermark রচিত 'History of Marriage' গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর সমাজতত্ত্বে আগ্রহের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ইংলন্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা কাজে যোগাদন করেন এবং সেখানে তিনি রিভার্সের কাজে গবেষণা শুরু করেন। 1924 সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ঘুরে ভারতের সমাজ অধ্যয়নে ভারতবিদ্যা (Indology) ও সামাজিক নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা গভীরভাবে প্রকাশিত হল। তিনি মার্কসবাদ বা ক্রিয়াবাদকে গ্রহন করেননি। বরং তিনি পরিব্যাপ্তিবাদ (Diffusion-ism) দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। জাতব্যবস্থা, উপজাতি, পরিবার, বিবাহ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নগরজীবন, ধর্ম, ভারতীয় সমাজের ঐক্যসাধন ও তার সমস্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ঘুরে অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। 1984 সালে ২৪ শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

Ghurye রচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

(1) Caste and Race in India(1932)
(2) Culture and Society (1947)
(3) Indian Sadhus (1953)
(4) Family and Kin in Indo-European Culture (1955)
(5) Cities and Civilization (1962)
(6) Scheduled Tribes (The Aborigines So called and their Future) (1959, 1943)
(7) Indian Costume (1966)
(8) Social Tensions in India (1968)
(9) Whither India (1974)
(10) Vedic India (1979) ইত্যাদি।

(ক) ভারতের জাত ব্যবস্থা : ঘুরের দৃষ্টিভঙ্গী (Caste in India)

G. S. Ghurye মূলত পুঁথিগত তথ্য ও অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানের ম
ভারতে জাত ব্যবস্থার উদ্ভব, প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলো
করেছেন। তাঁর মতে যখন ইন্দো-আর্যরা ভারতে আসে তখন তাদের মধ্যে
জাত ছিল না। শুধুমাত্র তিনটি নির্দিষ্ট কর্ম-অনুসারী গোষ্ঠী ছিল। আন্তঃবিবাহ
(Inter marriage) তাদের মধ্যে নিষিদ্ধ না থাকলেও প্রচলিত ছিল না। ঘু
মতে ব্রাহ্মণরা মূলত ইন্দো আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছিল এবং প্র
মূলত ভারতে জাত ব্যবস্থা গড়ে তোলে। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ
মধ্যে যে আন্তঃবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল, তার থেকে ক্রমে জাত ব্যবস্থার উৎপ
ঘটে। ঘুরে বলেছেন ব্রাহ্মণ ছাড়াও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা ছিল দ্বিজ (Twice born)
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল উচ্চবর্ণের দ্বিজ এবং শূদ্রদের যেহেতু একবে
জন্ম তাই তাদের অবস্থান ছিল নিম্নে। শূদ্রদের এই কারণে অন্যদের থেকে পৃথ
থাকতে হতো এবং তাদের উপর বেশ কিছু বিধিনিষেধ ব্রাহ্মণরা আরোপ করেছিল
ব্রাহ্মণরা এভাবে সমাজে অভিভাবক হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের সমাজে এই ধরনের
উচ্চ ও আধিপত্যকারী ইমেজের জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষরাও ব্রাহ্মণদের অনুসরণ
করত। এই বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলি ক্রমে সংগঠিত হয় জাত আকারে, যখন সমাজে
পেশাগত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় ক্রিয়াগত পৃথকীকরণের ভিত্তিতে। ক্রমে এই পেশাগত
গোষ্ঠীগুলি আন্তঃবৈবাহিক (Endogamous) গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। আনুষ্ঠানিক
ক্রিয়াকর্মে শুদ্ধ-অশুদ্ধ (Purity-pollution) নীতিগুলিও ব্রাহ্মণরা ক্রমে আরোপ
করতে থাকে। ঘুরে তাই বলেছেন জাত ব্যবস্থা মূলত ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি, যা ক্রমে
ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ঘুরে বলেছেন, "Caste in India is 'Brahmanic child', cradled in the land of the Ganga and Yamuna and hence transferred to other parts of the country" (Pramanick 1994:36)।

ঘুরে তাঁর 1932 সালে রচিত 'Caste and Race in India' গ্রন্থে ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাত ব্যবস্থার ছয়টি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। যথা—

(১) খন্ডভিত্তিক বিভাজন (Segmental division) : ঘুরের মতে, জাত হল সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি বদ্ধ ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির সদস্যপদ এমনভাবে বিভক্ত করে যেখানে প্রত্যেক

করে। তবে ঘুরে বলেছেন এই বিভাজন কিন্তু সাবেকী ভারতীয় সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে যেত না, বরং সমাজের সাথে জাত ব্যবস্থার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকতো, যা আধুনিক সমাজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ঘুরে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "...the segmental division did not go against the interests of the larger society in traditional India as an individual's adherence to caste-codes, his caste-patriotism and he like used to be controlled by the larger society. Modern developments have affected this harmonious relationship between castes and the larger society and it has become a threat to social unity" (Pramanick 1994:22)।

(২) **ক্রমোচ্চবিন্যাস (Hicarchical division) :** জাত ব্যবস্থার মধ্যে একটি ক্রমোচ্চবিন্যাস দেখা যায় যেখানে ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠস্থান দখল করে আছে। অন্যদিকে অস্পৃশ্যরা সর্ব নিম্নে অবস্থান করে আছে। কিন্তু ঘুরে বলেছেন ভারতে বিভিন্ন জাতের মধ্যে ক্রমোচ্চ বিন্যাসটি খুব একটা সুস্পষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জাতের অবস্থান (Rank) নির্ধারিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় আধিপত্যশীল জাত কর্তৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, অন্যান্য জাতের আপেক্ষিক মর্যাদার প্রমাণ নিয়ে সংশয় থাকলেও ব্রাহ্মণদের চূড়ান্ত মর্যাদা নিয়ে কোন সংশয় নেই।

(৩) **খাদ্যগ্রহন ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ (Restrictions on feeding and Social intercourse) :** বিভিন্ন জাতের মধ্যে খাদ্য, পানীয় গ্রহণ ও সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও শুদ্ধ অশুদ্ধ নীতিটি দেখা যায়। কিন্তু ঘুরের মতে, 'হিন্দুস্থান', যেখানে মূলত জাতের উৎপত্তি হয়েছে সেখানে কিন্তু এই বিধিনিষেধ এতটা তীব্র নয়। কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এই বিধি নিষেধগুলোকে কঠোরভাবে মানা হয়।

(৪) **বিভিন্ন জাতের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার এবং বিধিনিষেধ সমূহ (Civil and religious disabilities and privileges of the different sections):** ঘুরের মতে হিন্দু সমাজ ক্রমোচ্চশীলতায় বিভক্ত বলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের অধিকার ও কর্তব্যগুলি সমানভাবে বন্টিত নয়। সাধারণভাবে উচ্চজাতগুলি সমস্ত প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করত। অন্যান্য নীচু জাতগুলিকে সেই সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। মূলত রাজধর্ম পালনের নামে আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী জাত ও রাজার সহায়তায় এই সকল অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও বিধিনিষেধগুলিকে কার্যকরী করা হতো।

(২) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (Technological changes): ঘুরে বলেছেন যে, ব্রিটিশ কর্তৃক শিল্পায়ন ও নতুন ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার জাত ব্যবস্থার ভাঙনকে তরান্বিত করেছে। নগর ও শহরের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর ফলে মানুষের পক্ষে জাত ব্যবস্থার শুদ্ধ-অশুদ্ধর নীতিগুলিকে মেনে চলা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে জাত ব্যবস্থার বিধিনিষেধগুলি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করে। ঘুরে মনে করতেন উন্নয়নের জন্য এই পরিবর্তনগুলি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই তিনি এগুলির আহ্বান জানিয়েছিলেন।

(৩) পেশাগত পরিবর্তন (Occupational changes) : ব্রিটিশ আমলে পেশাগত ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে পুরোনো পেশার পরিবর্তে নতুন পেশায় যোগদান করতে শুরু করে। অর্থাৎ শিল্পায়নের ফলে এরা নতুন পেশা কাঠামোতে যুক্ত হয়ে পড়ে। ঘুরের মতে এইভাবে জাত ব্যবস্থার সনাতন অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস হয়েছিল।

তবে ঘুরে মনে করতেন, ব্রিটিশরা কিন্তু ভারতে জাত ব্যবস্থার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রকৃত অবলুপ্তি চায়নি। তারা জাত ব্যবস্থার ভেদাভেদকে টিকিয়ে রেখে বিভিন্ন জাতের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল উপনিবেশিক স্বার্থে। তাই তারা জাত ব্যবস্থার প্রথাগুলিকে অক্ষত রেখেছিল। অস্পৃশ্যতার বিধিনিষেধগুলো ও অবলুপ্ত হয়নি। কারণ ব্রিটিশ সরকার এই বিধিনিষেধ দূর করার কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাই করেনি বলে ঘুরে মত প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিভাজন করে রাখার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতিগঠন (Nation building) -এর পথকে বন্ধ রাখা। কারণ বিভিন্ন জাতের ঐক্য তাদের উপনিবেশিক শাসনকে আঘাত করতে পারে—এই ভয় থেকেই ব্রিটিশরা জাত ব্যবস্থাকে ও জাত বৈষম্য টিকিয়ে রাখাতে চেয়েছিল বলে ঘুরে মনে করেন। তাই ঘুরে তাঁর 'Caste and Class in India (1957) গ্রন্থে বলেছেন, "The British rulers of India never seem to have given much thought to the problem of caste, in so far as it affects nationhood of India... Their measure generally have been promulgated piecemeal and with due regard to the safety of the British domination" (Pramanick 1994:40)। তাই ঘুরে বলেছেন পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা জাতবিভাজনকে উৎসাহিত করেছে এবং স্বাধীন ভারতেও এই বিভাজন আরো গভীরভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

ঘুরে বলেছেন প্রত্যেকটি জাতের তার নিজ জাতগোষ্ঠীর প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় সম্পর্কিত বা সংযুক্ত থাকা কিন্তু ভারতের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে

(৫) পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ (Lack of unrestricted choice of occupation): ঘুরে বলেছেন জাতের সাথে কর্মের নির্দিষ্ট সম্পর্ক না থাকলেও পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ ছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্যের পেশা এবং জ্ঞানচর্চা-পুঁথি শিক্ষাদানে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এছাড়াও তারা অন্যান্য পেশা গ্রহণ করতে পারলেও অন্যান্য জাত কিন্তু তাদের জাতভিত্তিক পেশার বাইরে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারতো না।

(৬) বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ (Restriction on marriage): ঘুরে আন্তঃবিবাহ (Endogamy) প্রথাকে জাত ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে জাতের চেয়ে উপজাতের (subcaste) মধ্যেই আন্তঃবিবাহ বেশী প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ নিজ জাতের মধ্যেই বিবাহ স্বীকৃত ছিল। অন্যজাতের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ভারতে জাত ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিকেরা মন্তব্য করেন যে আধুনিক ভারতে জাত ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ ও প্রকৃতিকে বুঝতে হলে ভারতে ব্রিটিশ আমলের জাত ব্যবস্থার প্রকৃতিটি বুঝতে হবে। ঘুরের মতে ভারতীয় সমাজ অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে এক বহুত্ববাদী সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এর মূল বীজটি নিহিত রয়েছে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার মধ্যে। তাই ঘুরে ব্রিটিশ ভারতে জাত ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রকৃতিটিকে তুলে ধরেছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে যেসমস্ত বিষয় বা শক্তিগুলি জাত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল ঘুরের মতে সেগুলি হল —

(১) আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন (Legal and institutional change) : ব্রিটিশ যুগে সমগ্র দেশব্যাপী এক সাধারণ আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তাছাড়া অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেও কিছু আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জাত ব্যবস্থার প্রচলিত বহু অমানবিক আচরণ ও প্রতিষ্ঠানগুলির অপসারণ করা হয় এবং অনুন্নত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের জন্যও কিছু আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষেত্রগুলিতে অস্পৃশ্যদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও ভারতীয় জনগণকে জাতের ভিত্তিতে বিভক্ত করে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরিতে নিযুক্তির কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঘুরে এই সংরক্ষণের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে 'Caste and Class in India'(1957) গ্রন্থে বলেছিলেন যে, "...there is much justification for demanding come representation for the untouchable classes in the local and legislative bodies" (Pramanick 1994:39)।

বিপজ্জনক। স্বাধীন ভারতে এই বিষয়টি চরম আকার ধারণ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে জাত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। শাসনব্যবস্থা সংবিধানের সাম্যের নীতিগুলিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নিম্ন আর্থসামাজিক জাতগুলির রাজনৈতিক সচেতনতা সমস্যাকে আরো গভীর করেছে। ঘুরের মতে প্রত্যেক জাতের জাত প্রীতি ও জাতভিত্তিক মানসিকতা স্বাধীনভারতে জাতীয় ঐক্যের পথে এক অন্যতম বাধা। ঘুরে বলেছেন স্বাধীন ভারত জাতহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যের পরিবর্তে জাত ব্যবস্থাকে নিয়ে এক বহুত্ববাদী সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীন ভারতে জাত ব্যবস্থা টিকে থাকার পিছনে বা বলা যায় জাতের অনুভূতিগুলি শক্তিশালী হওয়ার পিছনে আরো অন্যান্য যে বিষয়গুলি দায়ী রয়েছে সেগুলিকে ঘুরে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল, প্রথমতঃ আধুনিক ভারতে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জ্ঞাতিগোষ্ঠী (kinship) এখনো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়তঃ জাত সংগঠন (caste association) গুলির সংখ্যা ও তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা জাতগুলির স্বার্থ সচতেনতাকে গুরুত্ব দিয়ে জাত আন্দোলনকে উজ্জীবিত করছে। চতুর্থতঃ বিভিন্ন জাতের জন্য জাত ভিত্তিক অর্থসহায়তা সংস্থা গড়ে উঠেছে। ঘুরের মতে, পূর্বে যেমন জাতভিত্তিক আন্তঃনির্ভরশীলতা দেখা যেত, বর্তমানে তা পরিলক্ষিত হয় না। বরং বর্তমানে বিভিন্ন জাতের দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, স্বার্থ সংঘাতের মাত্রা এই বহুত্ববাদী ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে ঘুরে মত প্রকাশ করেন।

(খ) ভারতের উপজাতি (Tribe) সম্পর্কিত ধারণা : ঘুরের অভিমত

ভারতের উপজাতি নিয়ে G. S. Ghurye-র চিন্তাভাবনা তাঁর 'The Aborigines-so-called-and their Future'(1943) [এই গ্রন্থটি 1959 সালে 'The Scheduled Tribes নামে প্রকাশিত হয়।], 'The Mahadev Kolis' (1957) নামক গ্রন্থগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। উপজাতি সম্পর্কে ঘুরে মূলত 'আত্তিকরণ মতবাদ (Assimilation Approach) দিয়েছেন। কারণ ঘুরে মনে করতেন উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদেরও হিন্দুত্বকরণ ঘটেছে। তিনি আরো বলেছেন যে, উপজাতিরা প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু', যাঁরা যে কোনো কারণে হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি তাঁর 'The Scheduled Tribe' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, এদের ভাষা, অর্থনীতি এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অঞ্চলে বসবাস করে সেখানকার আদিবাসিন্দা তারা নয়। তাই

'Kinship and Social Organization' (1914) গ্রন্থটিতে Smith-এর উল্লেখ
যোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুতপক্ষে Rivers-এর এই ব্যাপ্তিবাদ দ্বারা G. S.
Ghurye বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঘুরে এই ব্যাপ্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে
সংস্কৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতি সমাজ কাঠামো এবং ব্যক্তি
আচরণকে প্রভাবিত করে। ঘুরের মতানুযায়ী মানুষের উদ্যম, আদর্শ, মূল্যবোধ
সংক্রান্ত বিষয়গুলি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু। প্রত্যেক সমাজ ও
সভ্যতাতে এগুলির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এগুলিই সূক্ষ্মভাবে ব্যক্তি ও তার সামাজিক
ক্রিয়াকে নির্দেশ করে দেয়। এদিক থেকে ঘুরের দৃষ্টিভঙ্গীকে 'Culturological'
বলা যেতে পারে (ভট্টাচার্য ২০১২:৩০৬)। যাই হোক্ ব্যাপ্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত
হলেও পরবর্তীকালে ঘুরে ব্যাপ্তিবাদের প্রতি আগ্রহ হারান। কারণ সময়ের সাথে
সাথে ব্যাপ্তিবাদ নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাক্-অক্ষর সমাজ
ও উপজাতি সমাজের সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতে ব্যাপ্তিবাদকে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অন্য
ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকরা উপজাতি সমাজ গবেষণাতে ব্যাপ্তিবাদকে গ্রহণ করেছিলেন।
কিন্তু ঘুরে যেহেতু ভারতের সভ্যতার বিবর্তন নিয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন, তাই
তিনি এক্ষেত্রে ব্যাপ্তিবাদকে অনুপযুক্ত মনে করেন এবং হিন্দু সভ্যতা, যা মূলত
একটি প্রাচীন ও জটিল সভ্যতা (complex civilization) হিসাবে পরিচিত, তার
পরিবর্তনশীলতাকে বোঝার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আত্তিকরণ বা কৃষ্টিমিশ্রণ প্রক্রিয়াটি
(Acculturation Process) বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ঘুরের মতে ভারতের সাংস্কৃতিক
ঐক্য এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক উন্নয়নের ফল এবং এই সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধনে হিন্দু
ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এক গভীর প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ এই সংস্কৃতিকে
গ্রহণ করেছিল এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি বৃহত্তর হিন্দু
সংস্কৃতির সাথে অঙ্গীভূত বা সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। Ghurye তাই বলেছেন,
"India...has been the home of many ethnic stocks and cultures from prehistoric times. At the dawn of her history, the cultural differences in her population appear rather great. Nevertheless, the process of assimilation of smaller groups of different cultures into larger ones of more or less homogeneous culture has been steadily going on" (Pramanick 1994).

ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঘুরে যখন জাত
ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন তিনি বলেছেন যে, জাত ব্যবস্থা মূলত
ব্রাহ্মনদের সৃষ্টি। ঘুরের মতে ব্রাহ্মণরা—যারা ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে
আলোকপ্রাপ্ত দিলেন, তারাই হিন্দু ধর্মের মৌলিক আদর্শ ও মূল্যবোধ

তিনি এদের 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহারের সমালোচনা করেন কারণ বিভিন্ন গল্প ও উপকথায় এদের হিন্দু সংস্কৃতির চিহ্ন রয়েছে। ঘুরের মতে উপজাতিদের তাই পৃথক পরিচিতি খোঁজা অনর্থক। বস্তুত পক্ষে ঘুরে এই কারণে উপজাতিদের 'পশ্চাদপদ হিন্দু' বা 'Backward Hindus' বলেছে এই যুক্তির সমর্থনে তিনি মধ্যভারতের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের অভ্যাস, চিন্তাভাবনা সম্পর্কিত তথ্য প্রমাণকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, ভুঁইয়া, গোন্ড, ওঁরাও, ভিল, কোল প্রভৃতি উপজাতিরা বাস্তবিকভাবে হিন্দু ধর্মকেই তাদের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিল। ঘুরে বলেছেন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পশ্চাতে অর্থনৈতিক প্রেষণা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ হিন্দুধর্ম গ্রহনের মাধ্যমে তারা তাদের উপজাতীয় পেশা পরিত্যাগ করে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন পেশা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছিল।

ঘুরে ভারতীয় উপজাতিদের তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, কিছু উপজাতি আছে যারা হিন্দু সমাজের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে গেছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের বেশিরভাগ উপজাতি রয়েছে যারা আংশিকভাবে হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। তৃতীয়ত, মূলত পাহাড়ী অঞ্চলের কিছু উপজাতি আছে যারা হিন্দু সংস্কৃতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। অর্থাৎ এরা হিন্দু সংস্কৃতিকে একটুও গ্রহণ করেনি।

ঘুরে বলেছেন, 'পশ্চাদপদ হিন্দু' (উপজাতিদের) দের পশ্চাদপদতার কারণ হল হিন্দু সমাজের সাথে সঠিকভাবে আত্তিকরণের অভাব। তাঁর মতে হিন্দু সমাজের ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও জীবনধারাগুলি আত্তিকরণের মাধ্যমেই এদের উন্নতি সম্ভব।

(গ) সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শহর : ঘুরের দৃষ্টিভঙ্গী (Culture, Civilization and City)

সংস্কৃতি ঃ

সমাজতাত্ত্বিক G. S. Ghurye সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিশেষ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বিবর্তনকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সংস্কৃতির বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ব্যাপ্তিবাদ (Diffusionism) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্যপ্তিবাদ অনুযায়ী সংস্কৃতি কোন একটি জায়গায় উৎপত্তি হয় এবং মানুষের যাওয়া আসা, স্থানান্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তা ক্রমশ অন্যত্র প্রসারলাভ করে। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে প্রসারের মাধ্যমে। এই ব্যাপ্তিবাদী ঘরানার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন G.E.Smith. Smith তাঁর 'The Diffusion of Culture' প্রবন্ধে এগিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নৃতাত্ত্বিক W.H.R.Rivers মূলত Elliot Smith-এর এই ব্যাপ্তিবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। Rivers রচিত 'History of Melanesian Society (1914) এবং

সমূহ গড়ে তুলে এবং এগুলির মাধ্যমেই কৃষ্টিমিশ্রণ ঘটেছে ও ভারতের ঐক্য সাধিত হয়েছে (ঘোষ ২০০০)।

সভ্যতা ঃ

ঘুরে বিশ্বাস করতেন যে ভারতের "আধুনিক সভ্যতার একটি সাধারণ ঐতিহ্য" (common heritage of modern civilization) আছে এবং এই সভ্যতা হল "মানবজাতির সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফল"। ঘুরে এটাও বলেছেন যে, কোন সভ্যতার উত্থান ও পতনের পেছনে কোন সংস্কৃতির দৃঢ় বিকাশ দায়ী রয়েছে। তাঁর মতে সমস্ত সভ্যতার উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে কিছু মূল্যবোধ (value) বিশেষভাবে কাজ করে। এই মূল্যবোধগুলিকে ঘুরে বলেছেন "সংস্কৃতির ভিত্তি" (foundations of culture)। ঘুরে সংস্কৃতির ভিত্তির পাঁচটি মূল্যবোধকে চিহ্নিত করেছেন (Pramanick 1994:117)। এগুলি হল—১) ধর্মীয় সচেতনতা (Religious consciousness); ২) বিবেক (concience) ৩) ন্যায় (Justice); ৪) জ্ঞান অর্জন ও প্রকাশের মুক্ত প্রচেষ্টা (Free pursuit of Knowledge and free expression); ৫) সহনশীলতা (Toleration)। ঘুরে তাঁর 'Religious Consciousness' (1965) এবং 'Shakespear on Conscience and Justice' (1965) গ্রন্থ দুটিতে বিভিন্ন সভ্যতাতে এই বিভিন্ন মূল্যবোধগুলি কিভাবে বিকশিত হয়েছে তার প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ঘুরে বলেছেন ধর্মীয় সচেতনতার মূল্যবোধটি মানবসভ্যতার সূত্রপাত থেকেই কাজ করে চলেছে। তবে বিবেক ও ন্যায়ের মূল্যবোধগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন। এগুলি ইউরোপের মধ্যযুগে সৃষ্টি হয়েছে। ঘুরে এই গ্রন্থ দুটিতে দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় সচেতনতার মূল্যবোধটি তিনটি প্রধান সভ্যতায় কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে। এই তিনটি সভ্যতা হল মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, ইজিপ্ট সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতা।

ঘুরে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সভ্যতা বিকাশের ধরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "Civilization is the sum total of social heritage projected on the social plane" (Pramanick 1994:119)। অর্থাৎ তার মতে, সামাজিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এমন সকল ঐতিহ্যের সমষ্টি হল সভ্যতা। সভ্যতা যেহেতু সমাজের বিভিন্ন গুণাবলীর অংশ তাই সভ্যতার উন্নতির সূচকগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতার সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমাজকে চারভাগে ভাগ করেছেন (Pramanick 1994:120)। এগুলি হল—১) সভ্য সমাজ (Civilized), ২) অতি সভ্য সমাজ (Highly civilized); ৩) অতি উচ্চ- পর্যায়ের সভ্যসমাজ (Very highly civilized) এবং ৪) সম্পূর্ণ সভ্যসমাজ (completely civilized)। এই বিভাজনগুলি করার

পর ঘুরে সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে চারটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রথমতঃ তাঁর মতে এমন কোন সমাজ নেই, যে সমাজগুলি অতি উচ্চপর্যায়ের বা সম্পূর্ণ সভ্য সমাজের অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ ঘুরে ক্রমাগত বা ধারাবাহিক প্রগতির নীতিতে (Law of continuous progress) বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে ইতিহাস মূলত সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। তাই সামাজিক বিবর্তন সামাজিক প্রগতিকে সূচীত করে। তাঁর এই বক্তব্যের সাথে তাই কোঁত, স্পেনসার ও গিডিংস-এর বক্তব্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। এমনকি L. T. Hobhouse (ঘুরের শিক্ষক ছিলেন) যে 'Social Development' বা সামাজিক উন্নয়নের ধারণা দিয়েছিলেন সেখানেও সামাজিক উন্নয়ন বলতে বিবর্তন ও প্রগতি—উভয়কেই চিহ্নিত করেছেন। তাই ঘুরের মতে অতিউচ্চ পর্যায়ের সভ্য সমাজে উত্তোরনের লক্ষ্যেই সমাজ এগিয়ে চলে। তৃতীয়তঃ সভ্যতার মাত্রা বিন্যাস বা পর্যায় (Gradation of civilization) তার মূল্যবোধের সাথে সহসম্পর্কীত। যেমন অতি সভ্য সমাজের মানুষজন ব্যাপকভাবে মানবতাবাদী ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে গ্রহণ করে থাকে। চতুর্থতঃ যে কোন সভ্যতা—তা উচ্চপর্যায়ের হোক বা নিম্নপর্যায়ের হোক—নির্দিষ্ট কিছু বা স্বতন্ত্র কিছু গুণাবলীকে বহন করে। Kroeber-এই বিষয়টিকে বলেছেন, " a coherent self consistent way of expressing certain behaviour or performing certain kinds of acts" (Pramanick 1994:121)। ঘুরে বলেছেন এই ধরণগুলি হল খুবই সুপ্ত প্রকৃতির, কিন্তু এই উপাদানগুলি মানুষের চিত্তকলা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস বা বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে পরিচালিত করে।

ঘুরে বলেছেন, সভ্যতার উত্থান ও পতন আছে। তাঁর মতে "Civilization is a collective endeavour in which the contributions of different individuals and different societies have been uneven" (Pramanick 1994:121)। অর্থাৎ সভ্যতা হল বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের ও বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফল। যদিও ব্যক্তিবর্গ ও সমাজগুলির অবদান সমান নয়, তবুও বলা যায় ব্যক্তিবর্গ ও সমাজের অসম অবদানের সমষ্টিতেই সভ্যতার সৃষ্টি হয়। ঘুরে তার 'The Occidental Civilization' (1947) গ্রন্থে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি 1300 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1925 খ্রীষ্টাব্দ সময়কাল টিকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, এই সময়ই পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ ঘটেছে। এই সভ্যতার বিকাশে যেসমস্ত সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপগুলি সমষ্টিগতভাবে অবদান রেখেছিল এই সময় সেগুলি হল চিত্রকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, নাটক, যাত্রা, বিজ্ঞান, দর্শন এবং অন্যান্য চিন্তাভাবনা। এই সভ্যতার বিকাশে যে সমস্ত দেশ বা ... অবদান ছিল সেগুলি হল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি,

আমেরিকা, ন্যাদারল্যাণ্ড প্রভৃতি। ঘুরের মতে এই সমস্ত সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের অবদানের ভিত্তিতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা ঃ

সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনেকেই পৃথক বিষয় বলে মনে করেন। ঘুরে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। তাঁর মতে সংস্কৃতি ব্যক্তিগত সাফল্যের একটি বিষয়। তাই ব্যক্তি যতবেশী সাফল্য অর্জন করবে সভ্যতা সমৃদ্ধ হবে ততবেশী। তাই তাঁর মতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি আন্তঃসম্পর্কিত। তিনি বলেছেন, "Culture and civilization are related in the sense that the more the individuals excel in their individual attainments, the richer will become the civilization" (Pramanick 1994:128)। ব্যক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তিকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথ—১) নিবিষ্ট অনুশীলনকারী (Absorption Practitioners); ২) সপ্রশংস বা উপলব্ধিমূলক অনুশীলনকারী (Appreciative Practitioners); ৩) উদ্যমী প্রচারক (Enthusiastic Disseminators) ৪) সংস্কৃতির দুঃসাহসিক সৃষ্টিকর্তা (Adventurous creators of culture) [ভট্টাচার্য ২০১২:৩১০ এবং Pramanick 1994:128]। ঘুরে বলেছেন ব্যক্তিগত দক্ষতা বা গুনাগুন অনুযায়ী সংস্কৃতির মাত্রা ও সভ্যতার পর্যায় বা মাত্রা নির্ভর করে নিম্নলিখিত ভাবে—

ব্যক্তির গুণ (Qualities of Individuals)	সংস্কৃতির মাত্রা (Levels of Culture)	সভ্যতার মাত্রা (Grade of Civilization)
1) নিবিষ্ট অনুশীলনকারী (Absorptive practitioners)	সংস্কৃতি সম্পন্ন (Cultured)	সভ্য সমাজ (Civilized)
2) সংপ্রশংস অনুশীলনকারী (Appreciative practitioners)	অতিসংস্কৃতি সম্পন্ন (Highly cultured)	অতি সভ্য সমাজ (Highly civilized)
3) উদ্যমী প্রচারক (Enthusiastic disseminators)	অতি উচ্চ পর্যায়ের সংস্কৃতি সম্পন্ন (Very highly cultured)	অতি উচ্চ পর্যায়ের সভ্য সমাজ (Very highly civilized)
4) সংস্কৃতির দুঃসাহসিক সৃষ্টিকর্তা (Adventurous creators of culture)	সম্পূর্ণ সংস্কৃতি সম্পন্ন (Completely cultured)	সম্পূর্ণ সভ্য সমাজ (Completely civilized)

শহর ঃ

শহর বা নগর সমাজ নিয়ে অধ্যয়ন বর্তমান ভারতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজতত্ত্ব ছাড়াও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানগুলিতে শহর বা নগরজীবন নিয়ে আলোচনা, অধ্যয়ন, গবেষণা বা তর্ক বিতর্ক কয়েক দশক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সমাজতত্ত্বে যেমন Louis Wirth নগরবাদকে জীবনের একটা পথ (Urbanism as a way of Life) বলেছেন। Robert Park এবং Earnest Burgess শহরের বাস্তুতান্ত্রিক মতবাদ (Ecological Approach) প্রদান করেছেন। কেওবা শহরের জনসংখ্যাগত দিকগুলিকে (Demograpic aspect) তুলে ধরেছেন; কেও কেও আবার শহরের সামাজিক কাঠামোকে পর্যালোচনা করেছেন। G. S. Ghurye কিন্তু শহর বা নগরকে ঠিক এভাবে দেখেননি। অর্থাৎ তিনি নগরায়নের বা নাগরিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক ফলাফল নিয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। বরং তিনি শহরগুলিকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করেছেন। এপ্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ঘুরে শহর নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন Patrick Geddes-এর কাজ থেকে। Patrick Geddes রচিত 'Cities in Evolution' (1919) গ্রন্থখানি ঘুরেকে শহর জীবন নিয়ে অধ্যয়নে বিশেষ প্রভাবিত ও আগ্রহী করে তুলেছিল। Geddes দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘুরে বলেছিলেন যে 'শহর হল সভ্যতার দর্পণ"। (city as a mirror of civilization)। যাইহোক ঘুরে শহরের প্রধান যে কাজটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষায় সাহায্য করা এবং নির্দিষ্ট যুগে সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্টগুলিকে বিকশিত করা। Swapan Kumar Paramick (1994:133 & 134) বলেছেন Ghurye তাঁর 'Cities and Civilization' (1962) গ্রন্থে শহরের প্রধান ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "The major function of the city is to perform a culturally integrative role to act as the point of focus and the centre of radiation of the major tenets of civilization of that age". ঘুরে ব্যবিলন, এথেন্স, রোম, কনস্ট্যান্টিনোপল, পাটলিপুত্র প্রভৃতির মতো শহরের উদাহরণ তুলে ধরে দেখিয়েছেন কিভাবে এই শহরগুলি সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছিল। Weber, Toynbee, Geddes, Mumford-এর মতো সমাজ-বিজ্ঞানীরাও সভ্যতাকে শহরের নিরিখে দেখেছিলেন। ঘুরেও তাঁদের সাথে সহমত পোষণ করে বলেছেন যে, শহর হল সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিনিধি স্বরূপ। লণ্ডন শহরের ব্যপক বিস্তার প্রসঙ্গে Patrick Geddes একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তা হল "City-region" বা "Conurbation". যে সব শহরগুলিতে এক মিলিয়নের বেশী জনসংখ্যা সেসব শহরগুলিকে Mumford বলেছেন, 'Metropolis' বা 'Megapolis'.

Indian civilization lack both competent knowledge and imagination (Pramanick 1994 : 138)।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, ঘুরে দেখিয়েছেন ভারতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সভ্যতার প্রতিনিধি হিসাবে শহরগুলি 'মেট্রোপলিস'-এর মতো এতটা গুরুত্ব ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তবে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শহরকে তিনি কখনই পৃথকভাবে দেখেননি। বরং এদের আন্তঃসম্পর্ককেই তিনি বিশেষভাবে গুরু দিয়েছেন। নগর নিয়ে ঘুরের অধ্যয়ণ ও ভাবনাচিন্তা পরবর্তীকালে M.S.A. Rao, I.P. Desai, A. Bopegamage প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদেরকেও নগরজীবন নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী করে তোলে।